ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

ভবভূতির দৃশ্যকাব্য: একটি পর্যালোচনা

বেবী বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ: "কাব্যেষু নাটকং রম্যম্"— কাব্যের ভিতরে নাটক রমণীয়। মুনি-ঋষিরা একে দেবতাদের কমনীয় এবং চক্ষুগ্রাহ্য যজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। তাছাড়া, বিচিত্র রুচিসম্পন্ন মানুষকে একমাত্র নাট্যকাব্যই সমভাবে আনন্দ দিতে পারে। সে কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে একসময় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে ধর্ম-অধর্ম, কর্তব্য-অকর্তব্য ভুলে গিয়ে পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে জগৎসংসারে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব অনুসারে মহর্ষি ভরতের নির্দেশনায় প্রথম নাট্যকাব্য মঞ্চস্থ হয়েছিল। সংস্কৃত সাাহিত্যে দেখা যায়, অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক প্রমুখ নাট্যকারদের হাতে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। কালিদাসোত্তর যুগে একজন অসাধারণ নাট্যকার হলেন ভবভূতি। তিনটিমাত্র দৃশ্যকাব্য— *মহাবীরচরিত*, *উত্তররামচরিত* ও *মালতীমাধব* রচনা করে তিনি খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত *রামায়ণ*-কে অবলম্বন করে রচিত *মহাবীরচরিত* ও *উত্তররামচরিত* নাটক। *রামায়ণের* আদর্শ যখন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত তখন ভবভূতি তাঁর নিজস্ব প্রতিভাবলে রামায়ণের ঊর্ধ্বে উঠে উক্ত নাট্যকাব্য দুটির মাধ্যমে রামকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার ধর্মতত্ত্বের ঊর্ধ্বে উঠে জীবন কীভাবে জীবনের জন্য কাজ করতে পারে তা দেখানো হয়েছে *মালতীমাধব* প্রকরণে। সেই সুদূর অতীতে নারীনেতৃত্বের উত্থানের পক্ষে এবং বলিপ্রথার বিরুদ্ধে ভবভূতি সচেষ্ট হয়েছেন। নাট্যতত্ত্বের আলোকে দৃশ্যকাব্যের সংজ্ঞা, তাঁর জীবন ও কাল, দৃশ্যকাব্যগুলোর বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, সমাজভাবনা, দৃশ্যকাব্যগুলোর বিশিষ্টতা, কাব্যগুলোর সমালোচনা, সর্বোপরি তাঁর সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

মানুষ বিশ্বসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তার মনে রয়েছে সৌন্দর্যানুভূতি তথা রসাস্বাদনের ক্ষমতা। কিন্তু শুধু আত্ম-অনুভূতির মাধ্যমে সে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। বরং নিজের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের অনুভূতিকে সে অপরের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়, যার সার্থক রূপায়ণে সৃষ্টি হয় শিল্প। আবার শিল্পকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন মাধ্যমের। এভাবে বর্ণ ও অক্ষররূপী ভাষাশিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। কবিগুরুর ভাষায়, "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"[১] সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাসের মতে, "নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয় তার শিল্পসঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য।"[২] ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুসারে এই সাহিত্য শব্দের প্রতিশব্দ হল কাব্য। সেখানে ছন্দবদ্ধ বা ছন্দহীন যে কোনো রচনাই কাব্য বা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত[৩]। যে কাব্য শুধু শ্রবণ করা যায় তাকে শ্রব্যকাব্য বলে।[৪] যে কাব্য শ্রবণের পাশাপাশি অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যমান করা সম্ভব তার নাম দৃশ্যকাব্য।[৫]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ভবভূতির জীবন ও কাল:

নাট্যকার ভবভূতির ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। তবে কবির নিজের লেখা দৃশ্যকাব্য তিনটিতে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাঁর জন্মস্থান, শিক্ষাদীক্ষা, পাণ্ডিত্য, বংশমর্যাদা, বংশে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্মাদি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভদেশের অন্তর্গত পদ্মপুর নামক নগরে কবির পূর্বপুরুষদের জন্ম। তাঁরা তৈত্তিরীয় বেদ শাখার অন্তর্গত কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এমন মানার্হ ও নমস্য বংশে গোপালভট্টের পুত্র নীলকণ্ঠের ঔরসে এবং জাতুকর্ণী দেবীর গর্ভে ভবভূতির জন্ম হয়। কবির গুরুদেব শ্রীভগবান জ্ঞাননিধি। মহান গুরুর সুযোগ্য শিষ্য ভবভূতি ব্যাকরণ, মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাথে সাথে তিনি বেদবক্তাও। বাগ্দেবী অনুগতা ভার্যার মতই তাঁকে অনুসরণ করতেন। পণ্ডিতেরা তাই তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন 'শ্রীকণ্ঠ'।

ভবভূতির রচনায় কালিদাসের প্রভাব রয়েছে। দৃশ্যভাবনা, চরিত্রচিত্রণসহ বহুক্ষেত্রে ভবভূতি কালিদাসের (আনু. খ্রি. চতুর্থ শতক) কাছে ঋণী। যেমন— *অভিজ্ঞানশকুন্তলা*-এর অদৃশ্য সানুমতী ও *উত্তররামচরিত*-এর ছায়াসীতা; *রঘুবংশ*-এর চিত্রদর্শন ও *উত্তররামচরিত*-এর চিত্রদর্শন, *অভিজ্ঞানশকুন্তলা*-এর স্মারকচিহ্ন অঙ্গুরীয়ক ও *উত্তররামচরিত*-এর স্মারকচিহ্ন দণ্ডকারণ্য। এসকল কারণে ভবভূতিকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী সময়ের কবি মনে করা যেতে পারে। আবার বামনের (খ্রিস্টিয় অষ্টম শতক) *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি* নামক গ্রন্থে কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যা ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এর প্রথম অঙ্কে[৬] এবং *মহাবীরচরিত*-এর দ্বিতীয় অঙ্কে[৭] দেখা যায়। অতএব, ভবভূতিকে বামনের অর্থাৎ খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী কাব্যকার মনে করা যেতে পারে।

ভবভূতির জীবনে ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কল্হণের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থ অনুসারে বলা যায়, ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কাণ্বকুব্জরাজ যশোবর্মা[৮], যিনি ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে কার্কটবংশীয় উত্তরপুরুষ ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। সেই হিসেবে ভবভূতিকে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের কাব্যকার মনে করা যেতে পারে।

ভবভূতির দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু

মহাবীরচরিত নাটকের বিষয়বস্তু:

আদিকবি বাল্মীকি-রচিত *রামায়ণ* কাহিনীর পূর্বভাগকে অবলম্বন করে ভবভূতি রচনা করেছেন *মহাবীরচরিত নাটক*। কাহিনীর শুরুতে দেখা যায়, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আগত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি যথাক্রমে জনক-তনয়া সীতা ও ঊর্মিলার পারস্পরিক অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে। গুরুজনদের মনে মনে ইচ্ছা শুভমণিকাঞ্চনযোগ সম্পন্ন। কিন্তু পরিস্থিতি তখন প্রতিকূল। কারণ, রাবণের দূত সর্বমায় এসে বলেন, "লঙ্কেশ্বর রাবণ অযোনিসম্ভূতা সীতাকে কামনা করেন।"[৯] সে সময়ে বিশ্বামিত্রের অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানে তাড়কাসুরের আক্রমণ শুরু হয়। বিশ্বামিত্রের আদেশে রামের বাণে তাড়কাসুর

নিহত হন। আবার বিশ্বামিত্রেরই আদেশে রাম-লক্ষ্মণ দুজনে জৃম্ভকাস্ত্র লাভ করেন। এবার রাম-সীতার বিবাহের পালা। শর্তানুযায়ী হরধনু ভেঙ্গে রামকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু ধনুটি আশ্রমে নেই। বিশ্বামিত্র যোগবলে তা নিয়ে আসেন। রাম তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন। শেষে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সাথে যথাক্রমে সীতা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ সম্পন্ন হয়। জনক রাজ্যে কেবল বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। বিবাহ-পরবর্তী কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে। এ সময় সেখানে উপস্থিত হন পরশুরাম। তিনি চান রামকে বিনাশ করতে। কারণ, হরধনু ভেঙ্গে রামচন্দ্র শিবকে তথা শিবভক্তদের অপমান করেছে। আসলে লঙ্কেশ্বরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং রাম-সীতার বিবাহের কথা দূত সর্বমায়ের মাধ্যমে রাবণের মন্ত্রী মাল্যবান জানতে পারেন। তাই কূটকৌশলী মাল্যবান পরম শিবভক্ত পরশুরামকে উত্তেজিত করে রামকে বিনাশের জন্য পাঠিয়েছেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হলেও ভীষণ যোদ্ধা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। শিবকে অপমান করা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই নানা বাক-বিতণ্ডার পর পরশুরামের সাথে রামের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত হন। শেষে রামের গুণে মুগ্ধ পরশুরাম রামকে তাঁর ধনু উপহার দিয়ে বলেন,"বৎস, এখন এই ধনু নিয়ে রাক্ষসবধের অধিকার তোমাতেই ন্যস্ত।"[১০] গুরুজনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বিদায় নেন। নববিবাহিত রামের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান তখন আসন্ন। আবার শুরু হয় মাল্যবানের চক্রান্ত। রাবণের ভগ্নি শূর্পণখার সাথে পরামর্শ করে তাঁকে দিয়ে অযোধ্যার বিশ্বস্ত দাসী মন্থরা সাজিয়ে দশরথের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মন্থরারূপী শূর্পণখা রামের মধ্যম মাতা কৈকেয়ীর কথা বলে পূর্বপ্রাপ্ত দুটি বর চেয়ে নেন। এতে রামের পরিবর্তে ভরত রাজা হবেন এবং একমাত্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হবেন— একথা বলা হয়। পিতৃসত্য পালন করতে রাম বনে গমন করেন। পঞ্চবটী বনে রামের হাতে খর, দূষণসহ চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ জন রাক্ষস নিহত হন। আবার একদা শূর্পণখা উক্ত বনে এসে রামকে কামনা করলে লক্ষ্মণের বাণে তাঁর নাক-চুল কাটা যায়। এখান থেকে পৌলস্ত্যবংশের সাথে রঘুবংশের ঘোর শত্রুতা শুরু হয়। একদা রাবণ মায়ামৃগের ছলনায় রাম ও লক্ষ্মণকে গৃহের বাইরে নিয়ে আসেন। সেই সুযোগে রাবণ সন্ন্যাসীর রূপ ধরে সীতাকে অপহরণ করেন। সীতার অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ বের হন। পথে মুমূর্ষু জটায়ু তাঁদের সীতা অপহরণের সংবাদ দেন। এসময় কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালী রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। রাবণের বন্ধু বালী। মাল্যবানের মাধ্যমে প্ররোচিত হয়েই বালী-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ আক্রান্ত হন। কিন্তু রামের হাতে বালী পরাজিত হন। এ সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবসহ হনুমান ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ। মৃত্যুর আগমুহূর্তে বালী সুগ্রীবকে রামের হাতে সমর্পণ করে বলেন, "রামচন্দ্র আজ থেকে সুগ্রীবকে তোমার কাছে দিলাম, একে তুমি গ্রহণ কর।"[১১] রাম-রাবণের আসন্ন যুদ্ধে সুগ্রীব রামের সহযোগী হবে। ফলে রাম-লক্ষ্মণের সাথে সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণের মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাগর বন্ধন করে তাঁরা লঙ্কায় উপস্থিত হন। কিন্তু লঙ্কেশ্বর তখনও সীতার প্রতি কামনাদৃষ্টি নিয়ে অশোকবনের দিকে তাকিয়ে আছেন। একপর্যায়ে শুরু হয় যুদ্ধ। যুদ্ধের শেষ দিকে রামের বাণে রাবণ নিহত হন। লঙ্কানগরী তখন প্রায় পুরুষশূন্য। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ কেউই আর বেঁচে নেই। তাই মানবীরূপী লঙ্কাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন বড় বোন অলকা।

রাবণ তাঁর প্রকৃত প্রাপ্তিই পেয়েছেন, রাবণের অভিশপ্ত জীবনেরও অবসান ঘটেছে— একথা অলকা জানান।

যুদ্ধশেষে অযোধ্যায় ফেরার পালা। নতুন রাজা বিভীষণের নির্দেশে পুষ্পকরথ প্রস্তুত করা হয়। সাগর, নদী, সরোবর, বন-বনানী, কৃষিক্ষেত ইত্যাদি অতিক্রম করে পুষ্পকরথ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রমুখদের নিয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হয়। হনুমানের কাছ থেকে খবর পেয়ে অযোধ্যানগরী আগেই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। গুরুজনেরা রাম-সীতাকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর পুনরায় রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন শুরু হয়। ভবভূতি সাতটি অঙ্কের মাধ্যমে এই কাহিনী গ্রথিত করেছেন। কাহিনীতে মাল্যবানের বিজ্ঞতা, শূর্পণখার নেতৃত্ব ইত্যাদি নতুন সংযোজন। আবার নানা যৌক্তিক কাহিনী সংযোজনের মাধ্যমে রামের চরিত্রকে রামায়ণ থেকে আরও মহত্তর করা হয়েছে। নানা অপশক্তিকে নিধন করার মাধ্যমে রামের মহাবীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই নাটকটির নাম *মহাবীরচরিত* একথা মনে করা যেতে পারে।

উত্তররামচরিত নাটকের বিষয়বস্তু

মহাবীরচরিত-এর পরবর্তী কাহিনী নিয়ে রচিত *উত্তররামচরিত*। কাহিনীর শুরুতে রামের রাজ্যাভিষেক শেষে আত্মীয়-স্বজনেরা বিদায় নিয়েছেন। মাতৃমণ্ডলীসহ গুরু বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী রঘুবংশের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়েছেন। আপনজনদের বিরহে সীতা তাই বিষন্ন। রামচন্দ্র রাজকার্য ছেড়ে সীতাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন। এমন সময় ঋষি বশিষ্ঠের কাছ থেকে বার্তা এল। বার্তায় রামকে প্রজানুরঞ্জনে এবং সীতার দোহদ পূরণে মনোযোগী হতে বলা হয়। উত্তরে রামচন্দ্র বলেন,

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥[১২]

(প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্নেহ, দয়া, সৌখ্য— এমনকি সীতাকে ত্যাগ করতেও আমার দুঃখ হবে না।)

এ সময় লক্ষ্মণ কতগুলি চিত্র নিয়ে আসেন। রাম-সীতার পূর্ববনবাস-জীবনের নানা ঘটনাবলী নিয়ে চিত্রগুলি আঁকা। দৃশ্য দেখতে দেখতে সীতার মনে পুনরায় বনভূমি দর্শনের বাসনা জেগে ওঠে। রাম তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সময় অনুচর দুর্মুখ এসে জানান— প্রজারা সীতার চরিত্রের শূচিতা সম্পর্কে সন্দিহান। রামের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তবু প্রজাদের ইচ্ছা ও সীতার বাসনার সাথে মিল রেখে তিনি সীতাকে বনবাসিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ ঘুমন্ত সীতাকে বনে নির্বাসন দিয়ে আসেন। অতঃপর ঘুম থেকে জেগে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর সীতা নিজেকে ভাগীরথী-গঙ্গার জলে সমর্পণ করেন। সেখানে সীতার দুইটি যমজ সন্তান লব ও কুশের জন্ম হয়। ভাগীরথী গঙ্গা ও পৃথিবী তাদের রক্ষা করেন। আবার গঙ্গা নিজেই সন্তান দুটিকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। সেখানে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়।

অতঃপর একদা শম্বুকবধের জন্য রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে আসেন। স্মৃতিবিজড়িত এই বনভূমি দেখে রামের মনে পুরানো শোক জেগে উঠতে পারে, এমনকি তিনি মূর্ছাও যেতে পারেন। তাই সীতার সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে রাম যাতে সুস্থ থাকেন— সেই ব্যবস্থা করেন অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা সীতাকে জানান, আজ লব-কুশের বার বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই নিজের চয়ন করা পুষ্পে দেবতার অর্চনা করলে তাদের মঙ্গল হবে— এই কথা বলে তিনি সীতাকে বনভূমিতে পাঠান। আবার তাঁর সাথেই রয়েছেন নদীচরিত্র তমসা। ভাগীরথীর প্রভাবে আজ দুজনেই অদৃশ্যা। ফুল তোলার ফাঁকে সীতা একসময় শুনতে পান তাঁর পুত্রতুল্য করীশাবকটি অন্য কোন মত্তহস্তী-কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। পূর্বাভ্যাসবশত সীতা বলে উঠেন, "আর্যপুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।"[১৩] রামচন্দ্র তা শুনতে পান। শম্বুকবধ শেষে তিনি পুষ্পকরথে করে অগস্ত্যের আশ্রমের দিকে যাচ্ছিলেন। অতঃপর সীতার কণ্ঠ শুনে তিনি সেখানে অবতরণ করেন। ততক্ষণে শাবকটি নিজেকে মুক্ত করে সঙ্গিনীর সঙ্গে খেলা করছিল। দেখা হয় সীতার বান্ধবী বনদেবতা বাসন্তীর সাথে। তিনি তাঁকে বনভূমির দৃশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাচ্ছিলেন। ফলে স্মৃতিচারণ করতে করতে রাম একসময় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। আবার অদৃশ্য সীতার হাতের স্পর্শে পুনরায় তাঁর জ্ঞান ফিরে পান। একসময় রাম বিদায় নিয়ে অগস্ত্যের আশ্রমের দিকে রওনা হন। সীতাও তাঁর গন্তব্যে ফিরে আসেন।

এদিকে সীতার অকারণ কলঙ্ক ও নির্বাসনকে পিতা জনক মেনে নিতে পারেন নি। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি চন্দ্রদ্বীপে তপস্যায় রত থেকেছিলেন। আজ তিনি প্রিয়বন্ধু বাল্মীকির আশ্রমে এসেছেন। এখানে আরও এসেছেন রামের মাতা কৌশল্যা, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী প্রমুখ। জনকের মনে ক্ষোভের অন্ত নেই। তিনি কৌশল্যাকে ভর্ৎসনা করে কঞ্চুকী গৃষ্টিকে বলেন, "প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যার কুশল তো?"[১৪] সবার কথোপকথনে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল। এ সময় আশ্রমে একটি 'অশ্ব' প্রবেশ করল। আসলে এটি রামের অশ্বমেধযজ্ঞের 'অশ্ব'। রক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতু। নানা বাকবিতণ্ডার পর একসময় লবের সাথে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ শুরু হয়। লব জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করে শত্রুসৈন্যের কোলাহল স্তব্ধ করে দেন। আবার চন্দ্রকেতু দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন। আকাশ থেকে তা দেখে রামচন্দ্র সেখানে অবতরণ করেন এবং যুদ্ধের এখানে অবসান ঘটে। উপস্থিত কুশের সঙ্গেও রামচন্দ্রের পরিচয় হয়। কিন্তু কেউ কারো প্রকৃত পরিচয় জানে না। নাটকের শেষ অঙ্কে একটি গর্ভনাটকের মঞ্চস্থ হওয়ার আয়োজন দেখা যায়। রামায়ণের অপ্রকাশিত কাহিনী নিয়ে এই নাটক রচিত। স্বর্গের অপ্সরাগণ এর পাত্র-পাত্রী। সেজন্য গঙ্গাতীরে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। সকল স্তরের প্রাণীকুলকে এখানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। রামের পরিবারের সকল সদস্যদের অলৌকিক শক্তিবলে নিয়ে আসা হয়েছে। লব-কুশকে চন্দ্রকেতুর সমমর্যাদায় বসানো হয়েছে। নাট্যকাহিনীতে সীতাবিসর্জনের ও বিসর্জন পরবর্তী সার্বিক ঘটনা দেখানো হয়। দর্শকদের কাছে তা বাস্তব বলে মনে হয়। এ সময় ভাগীরথীর জল প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়ে সেখান থেকে প্রকৃত সীতা উঠে আসেন। লব-কুশকেও মঞ্চে নিয়ে আসা হল। সীতার প্রতি পূর্বে যে অবিচার করা হয়েছিল দর্শকরা তা বুঝতে পারেন। শেষে প্রজাদের অনুরোধে রাম পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করেন। রাম-সীতার পুনর্মিলন সাধিত হয়।

মালতীমাধব প্রকরণের বিষয়বস্তু

মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভবভূতির দশ অঙ্কের *মালতীমাধব* প্রকরণটি। মাঝখানে এসেছে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রেমকাহিনী, যা প্রাসঙ্গিক কাহিনী হিসেবে পরিচিত। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূরিবসু ও দেবরাত সহপাঠাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, উভয়ের ভবিষ্য সন্তানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন, যাতে বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। পরবর্তীতে কর্মজীবনে উভয়েই মন্ত্রী হয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবনে ভূরিবসুর কন্যা মালতী এবং দেবরাতের পুত্র মাধবের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পূর্বপ্রতিশ্রুত শুভ পরিণয়টি এখনো ফলপ্রসূ হয়ে উঠে নি। এর কারণ রাজকামনাদৃষ্টি। পদ্মাবতীনগরেশ্বরের ইচ্ছা, মালতীর বিয়ে হবে তাঁরই নর্মসচিব নন্দনের সাথে। এই অবস্থায় রাজমন্ত্রিত্বে আসীন অসহায় ভূরিবসু ভগবতী কামন্দকীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কামন্দকী একনিষ্ঠা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী। তবু ধর্মাচারণের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন মানবপ্রেম নিয়ে এক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে এসেছেন। সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মালতী ও মাধবের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের জন্ম দিয়েছেন। বিকৃত তন্ত্রসাধক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা কর্তৃক অপহরণ করা মালতী বলিকাঠের নিচে বসেও প্রিয়জন মাধবের নামই স্মরণ করেছেন। মাধবও নিজের জীবন বাজি রেখে প্রেমিকাকে উদ্ধার করেছেন। উভয়ের প্রেমের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তবুও অন্ধবিবেকী রাজা প্রেমিক-প্রেমিকাকে মূল্যায়ন না করে নন্দনের সাথে মালতীর বিবাহের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এই অবস্থায় কামন্দকীর নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে মালতীর পরিবর্তে মালতী-সজ্জায় সজ্জিত মকরন্দের (মাধবের বন্ধু) সাথে নন্দনের বিবাহ সম্পন্ন করা হয়েছে। মালতী ও মাধবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন স্থানে। অতঃপর নকল বিবাহের বিষয়টি অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ রাজশক্তির সাথে মকরন্দের যুদ্ধ শুরু হয়। খবর পেয়ে মাধবও বীরবিক্রমে বন্ধুর সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। দুই বন্ধুর সম্মিলিত শক্তিতে রাজশক্তি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বামাচারী কাপালিক কপালকুণ্ডলা কর্তৃক মালতী দ্বিতীয়বার অপহৃত হয়েছেন। সেক্ষেত্রেও কামন্দকীর সাবেক শিষ্যা সৌদামিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় মালতী ফিরে এসেছেন তাঁর বাবা-মায়ের কোলে। শেষে রাজস্বীকৃতিতে এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে মালতীর সাথে মাধবের এবং মকরন্দের সাথে মদয়ন্তিকার (নন্দনের বোন) শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছে।

মহাবীরচরিত নাটকের চরিত্রচিত্রণ

রামঃ

মহাবীরচরিত নাটকের নায়ক হলেন রামচন্দ্র। আলঙ্কারিক ধনঞ্জয়ের মতে, "বিনীত, মধুর, ত্যাগী, কর্মদক্ষ, প্রিয়ভাষী, লোকপ্রিয়, পবিত্র, বাগ্মী, কুলীন, শান্ত, তরুণ, বুদ্ধিমান, উৎসাহী, প্রজ্ঞাশীল, কলাপরায়ণ, বীর, দৃঢ়চেতা, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধার্মিক ব্যক্তিই দৃশ্যকাব্যের নায়ক হয়ে থাকেন।"[১৫] তাড়কাসুর বধ, পরশুরামকে পরাজিত করা, বালী-বধ, চৌদ্দ হাজার চৌদ্দ জন রাক্ষসসহ রাবণবধের মাধ্যমে রামচন্দ্রের এই মহাবীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চেহারার ভিতরে রয়েছে একটি সৌম্যসুন্দর রূপ। মস্তকশিখাযুক্ত, ধনুর্ধারী, মৃগচর্মপরিহিত

রামচন্দ্রের সৌন্দর্য বড়ই সুন্দর। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতিও তাঁর রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ । যজ্ঞসম্ভূতা অনন্যসুন্দরী সীতাকে দেখে তিনি আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি বড় শক্তিমান। তবে অযথা অস্থানে শক্তি প্রয়োগে তাঁর ইচ্ছা নেই। গুরুজনের অনুরোধেই তিনি যজ্ঞবিনাশক স্ত্রীচরিত্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। আবার, সদ্যবিবাহিত রামচন্দ্র পরশুরাম কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও একেবারে অবিচল, অচল ও শান্ত। রাম হরধনু ভেঙ্গে শিব তথা শিবভক্তদের অপমান করেছেন— পরশুরাম তাই রামকে হত্যা করতে মিথিলার রাজভবনে প্রবেশ করেন। পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়কারী পরশুরামের বিক্রম দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু রাম বলেন, জামদগ্ন্যকে প্রতিহত করার শক্তি রাঘবের আছে। শেষে পরশুরাম পরাজিত হন এবং রামের গুণে মুগ্ধ পরশুরাম রামকে নিজের ধনু উপহার দিয়ে বিদায় নেন। *রামায়ণের* রামচরিত্র থেকে *মহাবীরচরিতের* রামকে কলঙ্কমুক্ত করা হয়েছে। *রামায়ণ* অনুসারে রামের চোরাবাণে বালী নিহত হন। কিন্তু *মহাবীরচরিতে* বালী নিজেই প্রথমে রামকে আক্রমণ করেন। দুর্বৃত্ত রাবণের প্রতিও রামের ধারণা ধনাত্মক। রাবণ সীতাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে রাম রুষ্ট হন নি। তাঁর মতে, এতে কোন অন্যায় নেই; বরং রাবণ শত্রু বা দুর্বৃত্ত হলেই কেবল বধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় মায়াপারদর্শী রাবণকে বধ করতে দেরি হলে আকাশবাণীর মাধ্যমে দেবতাদের পক্ষ থেকে তাঁকে বধ করতে অনুরোধ করা হয়। তখন রাম ব্রহ্মাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে বধ করেন। রামের চরিত্রে রয়েছে পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম সর্বোপরি ভারতীয় জনসমাজের জন্য অনুসরণীয় অসাধারণ পিতৃভক্তি। তবু তিনি রাজকর্তব্যচ্যুত নন। তাই দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত হচ্ছেন— এই সংবাদ জেনে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। কি করে তাঁদের রক্ষা করা যায় তার সুযোগ খুঁজছিলেন। পরে মাতার বর প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর বনগমনের সুযোগ আসে। এক্ষেত্রে সদ্যবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আনন্দিত হন। এত গুণের অধিকারী রামচন্দ্রকে তাই জৃম্ভকাস্ত্র, মহেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ধনু প্রভৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং নরবানর কর্তৃক সাহায্য করা হয়েছে। সকল উপহার-অস্ত্র ও গুরুজনের আশীর্বাদকে সাথে নিয়ে তিনি নিজেকে জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এসবের ভিতর দিয়ে ভবভূতির রামচন্দ্র অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়কের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পরশুরাম:

জমদগ্নের পুত্র পরশুরাম *মহাবীরচরিত* নাটকে প্রতিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পরশু শব্দের অর্থ কুঠার, যা তাঁর প্রধান অস্ত্র। তাই তিনি পরশুরাম। তিনি একজন একনিষ্ঠ শিবভক্ত। ব্রাহ্মণসন্তান হলেও তিনি একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। রজোগুণের অধিকারী আত্মগর্বিত এই মানুষটির ক্রোধই একমাত্র শত্রু। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এমনকি ক্ষত্রিয় ভ্রূণধারী অবলা নারী পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে রক্ষা পায় নি। পরশুরাম নিজেই বলেন—

উৎকৃত্যোৎকৃত্য গর্ভানপি শকলয়তঃ ক্ষত্রসন্তাপরোষা—
দুদ্দামস্যৈকবিংশত্যবধি বিধমতঃ সর্বতো রাজবংশ্যান্।[১৬]

(ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি ক্রোধবশে ক্ষাত্রনারীদের গর্ভস্থ পিণ্ডগুলোকে বারবার করে খণ্ড খণ্ড করেছি। সমস্ত দিকের সকল ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবদের একুশবার বিনাশ করেছি।)

নাটকে বিচক্ষণ চরিত্র মাল্যবানের দ্বারা তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন। রাম হরধনু ভেঙ্গে শিব তথা শিবভক্তদের অপমান করেছেন— এই সংবাদের সত্যাসত্য বিচার না করে পরশুরাম প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। রামের সাথে পরশুরামের যুদ্ধও হয়। শেষে রামের স্পর্শে পরশুরামের ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং নিজের ধনু রামকে উপহার দিয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে বনে চলে যান।

মাল্যবান:

লঙ্কারাজ্যের মন্ত্রী মাল্যবান একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সম্পর্কে তিনি রাবণের মাতামহ। তিনি রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী এবং সুকৌশলী। কিন্তু *মহাবীরচরিত* নাটকে প্রভু রাবণের অদম্য কামবাসনা ফলপ্রসূ করতে গিয়ে তাঁকে এ সকল যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। রাবণ চান অনন্যসুন্দরী সীতাকে বিবাহ করতে। সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য তিনি দূত সর্বমায়কে প্রেরণ করেন এবং শূর্পণখাকে ব্যবহার করেন। সীতার সদ্যবিবাহিত স্বামী রামকে হত্যা করার জন্য। তিনি পরশুরামকে ক্ষুব্ধ করেন ও বালীকে প্ররোচিত করেন। সকল কৌশল ব্যর্থ হলে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রনীতির কিছু ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। খর, দূষণ প্রমুখ রাক্ষসেরা রাবণের ভ্রাতা। অথচ রাষ্ট্রের স্বার্থে মাল্যবান তাঁদের হত্যার পরিকল্পনা করেছেন। শূর্পণখার সঙ্গে আলাপকালে এসকল তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আসলে মাল্যবান চরিত্রটি ভবভূতির নিজস্ব সৃষ্টি— যা মূল রামায়ণে নেই। বিশাখদত্তের চাণক্য, *উদয়ন*-কথাকাহিনীভিত্তিক নাট্যকাব্যের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। যৌগন্ধরায়ণ, চাণক্য সফল হলেও অসংযমী প্রভুর কারণেই মাল্যবানের ব্যর্থতা নেমে এসেছে।

রাবণ:

রামায়ণের রামচন্দ্রের প্রধান প্রতিপক্ষ রাবণচরিত্র এখানে অনেকটাই নিষ্প্রভ। কেবল নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে তাঁর উপস্থিতি। তিনি দুরাচারী, অহঙ্কারী সর্বোপরি নারীলিপ্সু। সুন্দরী ললনাদের ধরে এনে তিনি আটকে রেখেছিলেন। একবেণীধরা মলিনবসনা এসকল ললনাদের নতুন রাজা বিভীষণের আদেশে মুক্তি দেওয়া হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে তিনি সন্ধি করতেও প্রস্তুত। প্রবল পরাক্রমশালী বালীর কাছে পরাজিত হয়ে তিনি সন্ধি করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । তাঁর দৃষ্টিতে নারী মাতৃস্থানীয় নয়; বরং সুন্দর ললনা সম্পদসদৃশ। রাবণের দূত সর্বমায়ের ভাষায়— "জগতের সমস্ত সম্পদের মত যজ্ঞসম্ভূতা সীতা রাবণের অধিকারে আসা উচিত"[১৭]— এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাবণের মানসিকতা প্রকাশ পায়। তিনি কর্তব্যঅবহেলাকারী। কামের প্রতি মোহই তাঁকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে রেখেছে। লঙ্কারাজ্য যখন আক্রান্ত, শত্রুসৈন্যরা যখন রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে তখন নিজের সহধর্মিণী মন্দোদরী তাঁকে সতর্ক করলেও তিনি ভোগের দৃষ্টিতে সীতার আবাসস্থল অশোকবনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায় আকাশবাণীর মাধ্যমে

ঘোষিত হয়েছে— "সীতাকে রক্ষা করার জন্য, ত্রিভুবনবাসীদের প্রীতিলাভের জন্য, বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য, রাবণের অমরত্বলাভের জন্য রাবণকে বধ করা কর্তব্য।"[১৮] শেষে রামের হাতে দুর্বৃত্ত রাবণের পতন হয়েছে।

লক্ষ্মণ:

রামের বৈমাত্রেয় ভাই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ একজন সুদর্শন পুরুষ। নাটকের প্রথম অঙ্কে ঊর্মিলা প্রথম দর্শনেই লক্ষ্মণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। লক্ষ্মণ একজন বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে মাল্যবান বলেন, "অস্ত্রকুশলতায় এবং বীরত্বে তিনি রামের সমতুল্য।"[১৯] সুচতুর মাল্যবান তাই রামের সাথে তাঁকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। লক্ষ্মণ দনুকবন্ধ, মারীচসহ অজস্র রাক্ষসদের এবং রাবণের পুত্র মেঘনাদকে হত্যা করেন। ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকে তাই রামের সুযোগ্য ভ্রাতা ও একান্ত সহযোগী, ভুবনবিজয়ী বীর লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের মাধ্যমে জৃম্ভকাস্ত্র প্রদান করা হয়েছে। আবার, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি *রামায়ণের* মত *মহাবীরচরিত* নাটকেও প্রতিষ্ঠিত। সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি রামের সঙ্গে বনে গমন করতে দ্বিধা করেন নি। রাবণের অস্ত্রের আঘাতে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র ওষধিবৃক্ষ আনার জন্য হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বতে পাঠান। ফলে লক্ষ্মণ বেঁচে ওঠেন। এসকল দৃষ্টান্ত রাম ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সীতা:

রামায়ণ অনুসারে মিথিলারাজ জনকের পালিতকন্যা সীতা। একদা যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে জনক একটি ফুটফুটে কন্যাশিশুকে ভূমিতে দেখতে পান। তাকে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। *মহাবীরচরিত* নাটকে তিনিই নায়িকা। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে নায়কের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পূর্ণ স্ত্রীচরিত্রই নায়িকা। অর্থাৎ "যিনি ত্যাগী, কর্মকুশলা, রূপবতী, রূপযৌবনোৎসাহী, লোকপ্রিয়া, তেজস্বিনী, বিদুষী, সুচরিত্রা তিনিই নায়িকা।"[২০] *মহাবীরচরিতের* সীতা সুদর্শনা। নাটকের প্রথম অঙ্কে রামচন্দ্র তাঁকে দেখেই আকর্ষণ অনুভব করেন। অনুরূপভাবে রূপযৌবনোৎসাহী সীতাও রামকে দেখে অনুরূপ আকর্ষণ অনুভব করেন। সদ্যবিবাহিতা হলেও পতিপ্রাণা সীতা রামের সাথে বনগমনে উৎসাহী ছিলেন। *মহাবীরচরিতের* সীতার চরিত্রের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। ক্ষুব্ধ পরশুরাম-কর্তৃক রামচন্দ্র আক্রান্ত হলে সীতা সাধারণ নারীর মত রামকে বারংবার প্রতিহত করেছেন। আবার *রামায়ণের* সীতার মত *মহাবীরচরিতের* সীতার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও প্রতিবাদীভাব লক্ষ করা যায় না। *রামায়ণে* লঙ্কাবিজয়ের পর সীতা উদ্ধার হলে রাম তাঁকে তিরস্কার করেছেন। এক্ষেত্রে *রামায়ণের* সীতা যুক্তির সাথে রামের কথার প্রতিবাদ করেছেন, যা *মহাবীরচরিত* নাটকে দেখা যায় না। সেখানে সীতা তিরস্কৃতও হন নি; বরং পুষ্পকরথে চড়ে রামের সাথে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন।

শূর্পণখা:

শূর্পণখা নারীচরিত্রটির বৈশিষ্ট্য বাল্মীকির *রামায়ণ* থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বুদ্ধিমতী, আত্মপ্রত্যয়ী। লঙ্কারাজ্যের নীতিনির্ধারক মন্ত্রী মাল্যবানের সাথে তাঁকে পরামর্শ করতে দেখা যায়। সীতা-অপহরণ, বনবাসী রামসহ লক্ষ্মণকে হত্যার পরিকল্পনা, বিভীষণকে বিতাড়ন ইত্যাদি গোপনীয় বিষয়গুলি মন্ত্রী মাল্যবান শূর্পণখার সাথেই পরামর্শ করেছেন। মূল *রামায়ণে* মন্থরাই দশরথের কাছে বরপ্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু *মহাবীরচরিতে* মায়াবিনী শূর্পণখা মন্থরার রূপ ধরে দশরথের কাছে যান এবং রামকে বনবাসী করার জন্য বর চেয়ে নেন। মন্থরার চরিত্রে কিছু লাম্পট্যও রয়েছে। রামের দৈহিক সৌন্দর্যের মোহে পড়ে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে তিনি রামকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ফলে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখা নির্যাতিত হন।

***উত্তররামচরিত* নাটকের চরিত্রচিত্রণ:**

রাম

বাল্মীকি-*রামায়ণের* অবতারপুরুষ রামচন্দ্র ভবভূতির *উত্তররামচরিত* নাটকে একজন পত্নীপ্রেমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ রাজ্যশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[২১] কিন্তু এখানে পারিবারিক কর্তব্যের চেয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে। নিজের সহধর্মিণী সীতাকে রাম অত্যন্ত ভালবাসেন। দণ্ডকারণ্যে বসবাসকালীন রাম-সীতার অবস্থানের নানা ঘটনা চিত্রের দ্বারা তা প্রকাশ হয়েছে— যা তাঁদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ দাম্পত্য বন্ধনের পরিচায়ক। আবার, দণ্ডকারণ্য দর্শনে পত্নীবিরহিত রামের উক্তির দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবুও রামের কাছে পারিবারিক কর্তব্য থেকে প্রজামনোরঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। কুলগুরু বশিষ্ঠের বাণী অনুসরণ করে তাই তিনি বলেছেন—

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥[২২]

(প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য স্নেহ, দয়া, সৌখ্য— এমনকি সীতাকে ত্যাগ করতেও আমার দুঃখ হবে না।)

তবে কি রাম সহধর্মিণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন? এ বিষয়ে বনদেবী বাসন্তী রামকে ভর্ৎসনা করে বলেন— "প্রজানুরঞ্জক লক্ষ্মণের কুশলতো?"[২৩] আবার, ধরিত্রিদেবীও বলেছেন, "রাম আমার প্রতি, জনকের প্রতি, অগ্নির প্রতি আনুগত্য এবং সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য করেন নি।"[২৪] কিন্তু 'ছায়াসীতা' পর্বে সীতা রামহৃদয়ের গভীর ভালবাসা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বর্ণসীতা পাশে রেখে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেছেন— বনদেবী বাসন্তী একথা জানতে পেরেছেন। তাই রামের সম্পর্কে তাঁর উক্তি—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥[২৫]

(লোকোত্তর ব্যক্তিদের মন বজ্রের চেয়েও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল, কে তা জানতে পারে?)

নাটকের শেষ অঙ্কে গর্ভনাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে *উত্তররামচরিতের* রামকে সীতাপরিত্যাগের গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবে স্বামী হিসেবে এবং শাসক হিসেবে ভবভূতির রামচন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

চন্দ্রকেতু:

লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতু একজন বীরযোদ্ধা। তিনি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগেও পারদর্শী। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী, ক্ষাত্রতেজী, নির্ভীক সেনাপতি। অশ্বরক্ষক হিসেবে নিয়োজিত সেনাদের উপর লব প্রবল শরবর্ষণ শুরু করলে তিনি নিজেই সামনে এগিয়ে এসে লবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমার অধীন যারা তাঁদের তুমি বধ করছ কেন? নিশ্চয়ই তোমার বীরত্বের একমাত্র পরীক্ষাস্থল আমি"[২৬] ফলে চন্দ্রকেতু ও লবের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়। কিন্তু রথশূন্য, বর্মহীন লবকে দেখে তিনি তাঁকে একটি রথ উপহার দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে চন্দ্রকেতুর চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

লব-কুশ:

রাম-সীতা দম্পতির যমজপুত্র লব ও কুশ। লব কনিষ্ঠ এবং কুশ জ্যেষ্ঠ। মায়ের সাথে সাথে তাঁরা দুজনেই দেবতা ও ঋষিদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পান। জন্ম থেকেই জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতাধারী এই বালকদ্বয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। তাঁদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণে অপারগ। বাল্মীকি-আশ্রমের শিক্ষার্থিনী আত্রেয়ী তাই আশ্রম ছেড়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অন্যত্র চলে যান। বালক লব একজন মহান বীর ও আত্মমর্যাদাশীল। যজ্ঞাশ্ব রক্ষকদের দাম্ভিক উক্তি শুনে তাঁর মধ্যে ক্ষাত্রতেজ জেগে ওঠে। ফলে অশ্বরক্ষকের মূল সেনাপতি চন্দ্রকেতুর সাথে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। আবার, রামের বীরত্বের প্রশংসার তিনি যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে বলেন, "ব্রাহ্মণের শক্তি বাক্যে, অন্যদিকে বাহুবলের অধিকারী ক্ষত্রিয়রা। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হয়ে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তাঁকে দমন করায় রামের আবার কী প্রশংসা?"[২৭] এতে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকে কুশের উপস্থিতি অতি সামান্য সময়ের জন্য।[২৮] তবে এর মধ্য দিয়েই তাঁর বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কনিষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে রাজসৈন্যদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, একথা জানতে পেরে ভরতের আশ্রম থেকে প্রত্যাগত কুশ তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসেন। শত্রুর উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন, "আজ পৃথিবী থেকে রাজা নামটি পর্যন্ত মুছে ফেলতে চাই। অথবা সূর্যবংশের রাজাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধে তবে আমার ধনু ধন্য হবে।"[২৯] বীর হলেও বালকদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে সৌজন্যবোধ ও সরলতা। রামকে অভিবাদন জানানো, রাজর্ষি জনকের আহ্বানে সাড়া দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়।

সীতাঃ

ভারতীয় সাহিত্যের সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর সাথে সাথে বাল্মীকির *রামায়ণের* সীতাচরিত্রও নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভবভূতির *উত্তররামচরিতের* সীতাও তাঁদের সমতুল্য।[৩০] গর্ভবতী সীতাকে নির্বাসন, সীতার আত্মহত্যার উদ্যোগ, পুত্রদ্বয় থেকে দূরে বসবাস, জনগণের সম্মতিপ্রাপ্তি ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। সীতার চরিত্রে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত প্রকৃতিপ্রেম। বনের পশুপাখি তাঁর আপনজন, বনের হাতি তাঁর পুত্রতুল্য, বনদেবী বাসন্তী তাঁর আপন বান্ধবী। প্রকৃতিপ্রেমের এই বীজ চিত্রদর্শন পর্বে সীতার উক্তিতে দেখা যায়। অরণ্যবাসের চিত্র দেখে তিনি বলেছেন, "আমি আবার সুন্দর ও গভীর অরণ্যে বিচরণ করতে চাই, সেই স্নিগ্ধ পবিত্র ভাগীরথীর শীতল জলে অবগাহন করতে চাই।"[৩১] পরবর্তীতে বনবাসজীবনে নদীর সাথে, পশুপাখির সাথে একান্তভাবে বসবাসের মাধ্যমে তা সার্থক হয়েছে। সীতার হৃদয়ে রয়েছে অকৃত্রিম পতিভক্তি। মুমূর্ষু রাম সীতার স্পর্শে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় সমাজে পতিপ্রেমের এই বিরল চরিত্র *উত্তররামচরিত* নাটকে গর্ভনাটকের উপস্থাপনার মাধ্যমে রাম-সীতার মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

বাসন্তীঃ

উত্তররামচরিত নাটকে বাসন্তী হলেন বনদেবতা। বন-প্রকৃতিকে জীবন্ত দেবতারূপে কল্পনা করে ভবভূতি স্বতন্ত্রভাবে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। দেবতা হলেও পার্থিব মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। নদীচরিত্র তমসা, মুরলা, গোদাবরীর সাথে যেমন মানবপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন প্রকাশ পেয়েছে বাসন্তীও ঠিক তেমনি। বনের দেবী হলেও তিনি দণ্ডকারণ্যে আগত অতিথিদের পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। *উত্তররামচরিতে* মনুষ্যরূপী দেবতা বাসন্তী আগত আত্রেয়ীকে সরাসরি বলেছেন, "বৃক্ষের ছায়া, জল, ফল বা মূল যা কিছু তপস্যার উপযুক্ত সবই সম্পূর্ণ আপনার অধিকারে।"[৩২] বাসন্তীর বড় পরিচয় তিনি সীতার বান্ধবী। বনবাসজীবনে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকালে সীতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাই বিরহিণী সীতার দুঃখকে তিনি নিজের করে নিয়েছেন এবং রামকে কাছে পেয়ে সীতার মনের কথাই যেন নিজের মুখ দিয়ে বলেছেন। *রামায়ণ* থেকে স্বতন্ত্র এই চরিত্রটি সৃষ্টি ভবভূতির মেধার পরিচয় বহন করে।

আত্রেয়ীঃ

আত্রেয়ী একজন শিক্ষার্থিনী। চরিত্রটি নাট্যকার ভবভূতির স্বীয়সৃষ্টি। দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে তাঁর চরিত্র যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হয় তিনি সরলচিত্তা। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাই লব ও কুশের মত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করতে অপারগ হয়ে তিনি অগস্ত্যের আশ্রমে চলে আসেন।

মালতীমাধব প্রকরণের চরিত্রচিত্রণ:

মাধব:

বিদর্ভরাজ্যের অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধব হলেন *মালতীমাধব* প্রকরণের নায়ক। তিনি কুলীন, রূপবান, সংস্কৃতিবান ও বিদ্যানুরাগী। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি নিজ জন্মভূমি থেকে পদ্মাবতীনগরে চলে আসেন। প্রকরণের প্রাসঙ্গিক কাহিনীর নায়ক মকরন্দের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তাঁরা যেন একে অপরের অঙ্গের চন্দনরস, নয়নের শরচ্চন্দ্র ও হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ। তবে মাধব একজন আদর্শপ্রেমিক— দুষ্যন্ত, উদয়ন, পুরূরবা, অগ্নিমিত্র প্রমুখ নায়ক চরিত্র থেকে যা ভিন্ন। দুষ্যন্ত প্রমুখ চরিত্র বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরী ললনাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে মাধব একেবারে ভিন্ন। অবিবাহিত মাধব একমাত্র মালতীকেই ভালবেসেছেন। মালতীভিন্নহৃদয়ে জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি শ্মশানে নরমাংস বিক্রি করেছেন। আবার নরঘাতকের কবল থেকে উদ্ধার করে সংসারধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, “কেন তুমি সংসারকে সারহীন, জগৎকে রত্নহীন, মানুষকে আলোকহীন করতে প্রবৃত্ত হয়েছ? কেন তুমি বন্ধুহৃদয়কে মারতে চলেছ? কেন তুমি কন্দর্পকে দর্পহীন এবং লোকের নয়ননির্মাণকে নিষ্ফল করে জগৎকে জীর্ণ উদ্যানে পরিণত করতে চাইছ?”[৩৩] তাই অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে মাধব একজন আদর্শ অনুকূলনায়ক।[৩৪]

মালতী:

পদ্মাবতীনগররাজ্যের মন্ত্রী ভূরিবসুতনয়া মালতী *মালতীমাধব* প্রকরণের নায়িকা। অত্যন্ত সুন্দরী এই কন্যাকে স্রষ্টা যেন চন্দ্র, সুধা, মৃণাল, জ্যোৎস্না প্রভৃতি সৌন্দর্য উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যানুরাগী, শিল্পপিপাসু, বিদুষী কন্যা মালতী তাঁর সখী লবঙ্গিকাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন। এমনকি মরণের পরে নিজের হৃদয় সখীর হৃদয়ে স্থাপন করে বেঁচে থাকতে চান। মালতী একান্তভাবে ভালবাসেন মাধবকে। কিন্তু তাঁর ভালবাসা অনিয়ন্ত্রিত নয়। একদা সখী লবঙ্গিকা তাঁকে মাধবকে গ্রহণ করার অনুরোধ করলে তিনি বলেন, “হা ধিক্, কন্যকাজনের পক্ষে এ কোন অশোভন কথাবার্তা বলছ?”[৩৫] সে কারণে সামাজিক কর্তব্যে অধিক বলিয়ান মালতী পিতার বংশমর্যাদার কথা বিবেচনা করে প্রিয়জন মাধবকে নিয়ে কখনোই প্রেমপলায়ন করতে পারেন নি। M. R. Kale তাই বলেন— `She has wonderful mastery over herself and keeps her passion always under check.’[৩৬] সত্যিকারে এক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজসংস্কার মালতীকে অসংযমী হতে বাধা দিয়েছে।

কামন্দকী:

কামন্দকী একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। পদ্মাবতীনগরে অবস্থিত বৌদ্ধমঠের তিনি অধ্যক্ষ। *মালতীমাধব* প্রকরণে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র এটি। M. R. Kale এর মতে, “The

most conspicuous personage in the play is certainly Kamandaki."[৩৭] রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করে সুকৌশলে তিনি নর-নারীর ভালবাসাকে ফলপ্রসূ করেছেন। মালতী-মাধবের প্রেম— পরস্পর ছবি-বিনিময়, মালা-বিনিময়, নগরদেবতার মন্দিরে সাক্ষাৎ, চৌরিকাবিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে কামন্দকীর পরিকল্পনায়ই সার্থক হয়েছে। বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হয়েও জীবনের প্রতি ভালবাসা কামন্দকীর চরিত্রকে তাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

মকরন্দঃ

মকরন্দ হলেন *মালতীমাধব* প্রকরণের পীঠমর্দ। "নাটকের প্রাসঙ্গিক কাহিনীর যে কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়কের পাশাপাশি আলাদা ফল লাভ করেন তিনিই পীঠমর্দ।"[৩৮] মাধবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। এরা একে অপরকে জানেন বোঝেন। সবচেয়ে বড় বিষয় মালতী-মাধবের প্রেমকে সার্থক করার জন্য তিনি নকল মালতী সেজে মালতীকে পালাতে সাহায্য করেন। নকল মালতীর সাথে রাজার নর্মসচিব নন্দনের বিবাহ ও বাসররাত অনুষ্ঠিত হয় যা *মালতীমাধব* প্রকরণে 'নন্দবিপ্রলম্ভ' নামে পরিচিত। এই পার্শ্বনায়কের সাথে মদয়ন্তিকার প্রেম ফলপ্রসূ হয়েছে। এভাবেই পীঠমর্দচরিত্র মকরন্দ ফল লাভ করেছেন।

***মহাবীরচরিত*এর সমাজভাবনা:**

নাটককে জীবন-দর্পণ বলা হয়, আর তাই প্রায় সব নাটকেই তৎকালীন রীতি-নীতির ও সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, নাটকের বিষয়বস্তু যে সময়ের, মূলত সেই সময়ের জীবনধারাই তাতে প্রতিফলিত হয়; কবির কালের নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে যদি দুইশ বছর আগের কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখা হয় তবে উক্ত নাটকে তৎকালীন সমাজের ছবিই ফুটে উঠবে; এখনকার নয়। সমসাময়িক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে লেখা নাটকে অবশ্য এ প্রশ্ন ওঠে না। তবে প্রচলিত প্রসিদ্ধবৃত্তান্ত (যেমন— *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ* প্রভৃতি) নাটকের উপজীব্য করলেও নাট্যকারেরা অনেক অভিনব বিষয় সংযোজন করে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেন। ফলে পরোক্ষভাবে হলেও তাতে সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। *মহাবীরচরিত* নাটকেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

এ নাটকে তখনকার সময়ের গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন— নাটকে পরশুরামের গুরু মহাদেবের হরধনু ভাঙ্গায় গুরুদেবের অপমানে পরশুরামের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতি দ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাই পরশুরাম বলেন, "গুরুদেবের অপমানকারীকে নিধন না করে আমি আচার্যদেব মহাদেব ও আচার্যপত্নী পার্বতীর মুখও দেখতে চাই না।"[৩৯] *মহাবীরচরিত* নাটকে বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় কোনো শুভকাজ সম্পন্ন হলে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হত। যেমন— পরশুরাম ও রামের পারস্পরিক যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত হলে বিমানচারী দেবতারা তা দেখতে পেয়ে সম্মিলিতভাবে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন

এবং রামের পক্ষে জয়ধ্বনি করতে করতে বলেন,"জয়–ত্রিজগতের রক্ষক, সূর্যবংশের চন্দ্র রামচন্দ্রের জয়; সংসারে অভয়দানব্রতেনিরত, ক্ষত্রিয়শত্রু পরশুরামের বিজেতা রাঘবের জয়।"[৪০] তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কোন ভাল কাজের জন্য খুশি হয়ে বরদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন— রাজা দশরথ তাঁর মধ্যমা স্ত্রী কৈকেয়ীর সেবা-শুশ্রূষায় খুশি হয়ে তাকে দুটি বরদান করেছিলেন।

উপহার দেওয়ার প্রথা সে সমাজেও ছিল। যেমন— পরাজিত পরশুরাম তাঁর ধনু রামকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। আবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অগস্ত্য মুনি তাঁকে মহাদেবের ধনু উপহার দিয়েছিলেন। সে সময়ে পোশাক হিসেবে বিভিন্ন পশুর চামড়া ব্যবহার করা হত। লতা-পাতা এবং তার রস দিয়ে বিভিন্ন পোশাককে রাঙিয়ে তুলত। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, রাম ও লক্ষ্মণ রুরুমৃগের চর্ম পরিধান করেছেন যা মঞ্জিষ্ঠালতার রসে রঞ্জিত এবং মূর্বালতার মেখলা দিয়ে বাঁধা। আবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিধান করতে পছন্দ করত। যেমন, নাটকের পঞ্চম অঙ্কে কিস্কিন্ধ্যারাজ বালীর গলে স্বর্ণকমলের মালা, ঠিক যেন সন্ধ্যার রাগে রঞ্জিত বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ। বালীর মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ মালাটি তাঁর ভ্রাতা সুগ্রীবের গলে পরিয়ে দিলেন। সে সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। যেমন, অযোধ্যার রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিনজন স্ত্রী ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণেরও মন্দোদরীসহ একাধিক স্ত্রী ছিল বলে নাটকে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতির সাথেও তৎকালীন চিকিৎসা পদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে সময়েও বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হত। যেমন নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাম-রাবণের যুদ্ধে লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ রাবণের শতঘ্নী অস্ত্রের আঘাতে মূর্ছা গেলে হনুমান মূর্ছাভঙ্গের ঔষধযুক্ত গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসেন। তখনকার দিনে যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে রথ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যেমন, নাটকের সপ্তম অঙ্কে রাম-রাবণের পারস্পরিক যুদ্ধে রাম জয়লাভ করার পর সীতা, লক্ষ্মণ বিভীষণ সুগ্রীবসহ সকলে পুষ্পকরথে চড়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আশ্রম বা গুরুগৃহ কেন্দ্রিক। গুরু তার শিষ্যদের আশ্রমে বা গৃহে বসেই বেদসহ বিভিন্ন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার শিক্ষাদান করতেন। যেমন— নাটকে ঋষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে বিভিন্ন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁরা জৃম্ভকাস্ত্র, অচ্যুতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রভৃতি অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হয়েছিলেন। তখনকার রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ রাজস্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিতেন। নাটকে রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী মাল্যবান রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণের জয়ের জন্য পরশুরামকে রামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন এবং মন্থরারূপী শূর্পণখার বরপ্রার্থনার মাধ্যমে রামকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। রাবণের বন্ধু বালীকে তিনি রামবধের জন্য পাঠিয়েছেন।

উত্তররামচরিত নাটকের সমাজভাবনা:

উত্তররামচরিত নাটকে সমাজব্যবস্থার যে দিকটি প্রথমেই নজরে পড়ে তা হল— আশ্রম কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে যেমন আবাসিক ব্যবস্থা আছে সে সময়েও আশ্রমে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, আশ্রমে নানা জায়গা থেকে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের কাজে ঋষি বাল্মীকিসহ আশ্রমবাসীরা ভীষণ ব্যস্ত। আশ্রমের বিদ্যার্থী বালকদের তাই পড়াশুনা থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের আজ অনধ্যায়ের দিন। তারা খেলধূলা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, আশ্রমের শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা ছিল এবং চিত্তবিনোদনেরও বিভিন্ন মাধ্যম ছিল।

পুরুষের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষারও প্রচলন সমাজে ছিল। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী একজন শিক্ষার্থিনী। ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে বসে তিনি বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন। বাল্মীকি এখন *রামায়ণ* লেখা নিয়ে ব্যস্ত। ফলে আশ্রমের অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে সাথে আত্রেয়ীও বাল্মীকির শিক্ষাদান থেকে বঞ্চিত হন। তাই শিক্ষাকার্য অব্যাহত রাখার জন্য আত্রেয়ী সেই সুদূর বাল্মীকির আশ্রম থেকে দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে এসেছেন। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি *উত্তররামচরিতের* সমাজব্যবস্থায় শৈল্পিক নিদর্শনও পাওয়া যায়। যেমন, নাটকের প্রথম অঙ্কে লক্ষ্মণ রামের পূর্বজীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির দৃশ্যের যে চিত্র অঙ্কন করে এনেছেন তাতে তাঁর শৈল্পিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সমাজে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। বর্ণ অনুযায়ী কর্মবিভাগও ভিন্ন ছিল। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের কাজ হল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন এবং ক্ষত্রিয়ের কাজ হল যুদ্ধ করা, বৈশ্যের কাজ ব্যবসা করা আর শূদ্রের কাজ হল সেবামূলক কাজ করা। নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, শম্বুক নামে এক শূদ্রক তপস্যা করায় ব্রাহ্মণসন্তান মারা গেলেন। তখন রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে আকাশবাণী ঘোষিত হল— "শম্বুক নামে এক শূদ্র পৃথিবীতে তপস্যা করছে। হে রাম, তোমাকে তার শিরশ্ছেদ করতে হবে, তাকে হত্যা করে ব্রাহ্মণকে জীবিত কর।"[৪১] অর্থাৎ শূদ্রজাতির তপস্যা করা নিষিদ্ধ। তখনকার সমাজে তপস্যীদের বিভিন্ন যাগযজ্ঞাদিও নিয়তই বহমান ছিল। যেমন, এ নাটকে মহর্ষি বাল্মীকি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ মুনিঋষিরা বিভিন্ন যাগযজ্ঞাদি ও অনুষ্ঠান করতেন। রাজারাও বিভিন্ন যজ্ঞের আয়োজন করতেন। রাজা রামও অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

উত্তররামচরিতের সমাজও ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সমাজে নারীদের অবস্থান পুরুষদের মত দৃঢ় ছিল না। তাদের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হত। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, রাবণের গৃহে সীতা দীর্ঘদিন বসবাস করায় তাঁর চরিত্র নিয়ে প্রজাগণ সন্দিহান। একমাত্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। পুরুষদের কাছে নারীরা প্রতিনিয়ত এমন নির্মমতার শিকার হতেন। তখন রাজতান্ত্রিক শাসন

ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাইতো রাজা দশরথ পরবর্তী রাজা হিসেবে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন।

***মালতীমাধব* প্রকরণে সমাজভাবনা:**

মালতীমাধব প্রকরণে বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় নানা ধর্মাচারী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন ধর্মের অন্তর্গত শৈব সম্প্রদায়ের একই দেবতা শিব সেখানে বিভিন্ন নামে পূজিত হয়েছেন, যেমন— কালপ্রিয়নাথ, মহাদেব, শক্তিনাথ। সমাজে কামদেবতা বা মদনদেবের পূজাও প্রচলিত ছিল। শাক্ত-মতের অন্তর্গত তন্ত্রসাধনচর্চার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক প্রকরণটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তন্ত্রমতে— সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে রয়েছে এক মহাশক্তি। সৃষ্টির অন্তরে ও বাইরে সীমায় বা সীমার অতীতে যা কিছু সবই শক্তির প্রকাশ। মানবদেহে তিনি শব্দব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে প্রকাশিত।[৪২] প্রকরণটিতে উল্লিখিত বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন তন্ত্রসাধক হলেন অঘোরঘণ্ট ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা কপালকুণ্ডলা। রক্তবস্ত্রপরিহিত, রক্তচন্দনচর্চিত শিরোজটাধারী— কপালকুণ্ডলার গলে নরকপালের মালা, কানে নরকপালের কুণ্ডল, মালায় ঘণ্টা, হাতে চিমটা, চিমটায় বাঁধা ছোট পতাকা। প্রাণায়ামতত্ত্ব, পঞ্চামৃততত্ত্ব, নাড়িতত্ত্ব ইত্যাদি চর্চার ফলে মুলাধার পদ্মস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে তিনি জাগ্রত করতে সক্ষম।[৪৩] তন্ত্রসাধকদের সাধনালব্ধ শক্তির বিকৃত প্রয়োগ এবং শক্তিকে জগৎকল্যাণের কাজে উৎসর্গ করা— এই দুটি দিক *মালতীমাধব*-এর সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পদ্মাবতীনগরে অবস্থিত বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করে সমাজে বৌদ্ধধর্ম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মঠের অধ্যক্ষা সুশিক্ষিতা কামন্দকী, শিষ্যা অবলোকিতা, দাসী মন্দারিকা এঁরা সবাই বৌদ্ধধর্মের উদারনীতির সমর্থক, অর্থাৎ মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত। মহাযানীদের মতে, "নির্বাণ অর্থ আত্মমুক্তি বা বিলুপ্তি নয়। বিশ্বের দুঃখপীড়িত অসংখ্য মানুষের কথা বাদ দিয়ে আত্মমুক্তির মধ্যে জীবনের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। যিনি সত্যকে জেনেছেন, যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, মহাযানীদের যুক্তিমতে তিনিই বোধিসত্ত্ব লাভ করেছেন।"[৪৪] তবে বৌদ্ধধর্মের উদারনীতির সুযোগে সে সমাজে কিছু অনাচারও বাসা বেঁধেছিল।[৪৫] বৌদ্ধমঠের পরিচারিকা মন্দারিকার সাথে মাধবের ভৃত্য কলহংসের প্রেমই তার ইঙ্গিত।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন ও শিল্পে *মালতীমাধব*-এর সমাজ যথেষ্ট উন্নত ছিল। জ্ঞানচর্চার জন্য তখনকার মানুষ প্রয়োজনে ভিন দেশে পাড়ি জমাতেন। ভগবতী কামন্দকী, দেবরাত এবং ভূরিবসু এঁরা সবাই নানা দিগন্তবাসী হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্রজীবনে একজায়গায় সমবেত হয়েছিলেন।[৪৬] আবার যথোপযুক্ত বিদ্যার্জন শেষে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে কুণ্ডীনগর থেকে মাধব পদ্মাবতীনগরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। অতএব, পদ্মাবতীনগর জ্ঞানচর্চার জন্য যথোপযুক্ত পীঠস্থান ছিল— একথা বলা যেতে পারে। সমাজে দেবতাকে

আশ্রয় করে অথবা দেবমন্দিরভিত্তিক বিনোদন ও সংস্কৃতিচর্চা লক্ষ করা যায়। যেমন, কালপ্রিয়নাথের পূজা উপলক্ষে নাট্যোৎসব, আনন্দবিহার ইত্যাদি। দেবতাকেন্দ্রিক উৎসব আনন্দ ছাড়াও তখনকার সমাজে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যনির্ভর কৌমুদী-মহোৎসব প্রচলিত ছিল। নন্দনের বিবাহ উপলক্ষে প্রকরণটিতে এরকম একটি মহোৎসবের আয়োজন করতে দেখা যায়। আবার সুউচ্চ প্রাসাদ, প্রাসাদে সুপরিকল্পিত জানালা, বাতায়ন, দেবমন্দির, নগরপ্রবেশদ্বার, সুদীর্ঘ রাজপথ, বিশাল দীঘি, শানবাঁধানো ঘাট ইত্যাদি তখনকার দিনে উন্নত স্থাপত্যশিল্পের সাক্ষ্য বহন করে।

রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সুযোগে প্রকরণটিতে রাজাদের অনেকটা একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে সাধারণ নাগরিক তো দূরের কথা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদের পর্যন্ত প্রতিবাদ করার বা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করার কোন অবকাশ ছিল না। প্রকরণটিতে দেখা যায়, পদ্মাবতীশ্বর তাঁর নিজ অমাত্য ভূরিবসুর প্রতি প্রভুত্ব হেতু ভূরিবসুকন্যা মালতীকে নিজের নর্মসচিব নন্দনের জন্য দাবি করে বসেছেন। রাজশক্তির কাছে অসহায় ভূরিবসু তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, "মহারাজ নিজ কন্যাদের প্রভু।"[৪৭] এক্ষেত্রে বাল্যবন্ধু তথা সহপাঠী দেবরাতের পুত্র মাধবের সাথে নিজের কন্যা মালতীর পূর্বপ্রতিশ্রুতিগত বিবাহের বিষয়টি তিনি উত্থাপন করার সাহস পর্যন্ত করেন নি। নিজের অযোগ্য নর্মসচিবদের দিয়ে সুন্দরী ললনাদের বিবাহ করানোর এই অমানবিক পদক্ষেপ আসলে তৎকালীন সমাজের রাজাদের কাম-লালসা চরিতার্থ করার বিকৃত অপকৌশলেরই অংশ।

মালতীমাধব-র সমাজের নারীরা রক্ষণশীলতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পিতার বংশমর্যাদা শ্রেষ্ঠ, নাকি ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে প্রিয়তম মাধবের সাথে প্রেম-পলায়ন শ্রেষ্ঠ— এই উভয় সঙ্কটে মালতীর মাধ্যমে সেই রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার নারী মালতী এক্ষেত্রে পিতার পক্ষই অবলম্বন করেছেন। আবার প্রকরণের ষষ্ঠ অঙ্কে নগরদেবতার মন্দিরে নিজের অজান্তে মালতী প্রিয়তম মাধবকে আলিঙ্গন করে বসেন। প্রিয়সখি লবঙ্গিকা তাঁকে বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলে উঠেন, "কুলকন্যাদের পক্ষে এ কোন অশোভন কথাবার্তা বলছো?"[৪৮] তাই প্রকরণটিতে কাপালিকদের বলিকাঠের নিচে উল্লিখিত এই যে নারীবলি, আসলে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা অথবা রাজশক্তির কামনাদৃষ্টির মাধ্যমে নারীহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা বলির সমতুল্য। কিন্তু এই সামাজিক কুসংস্কার বা অপশক্তির কবল থেকে তখনকার মানুষ মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সংসারধর্ম ও ভালোবাসার জয়গানসহ মাধব কর্তৃক নরঘাতক অঘোরঘণ্টকে হত্যা, রাজশক্তি তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসা এবং মাধব ও মালতীর প্রেমের স্বীকৃতি প্রদানই তার প্রমাণ।

দৃশ্যকাব্যগুলোর বিশিষ্টতা:

মহাবীরচরিতের বিশিষ্টতা: এ নাটকে রামায়ণের কাহিনীকে সর্বত্র অনুসরণ করা হয় নি। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ-ঊর্মিলার প্রণয় সঞ্চার, রাবণের পুরোহিত সর্বমায় কর্তৃক রাবণের জন্য সীতাকে প্রার্থনা, তপস্যার প্রভাবে হরধনু বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আনয়ন, মাল্যবান কর্তৃক পরশুরামকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিতকরণ, রামবধের জন্য বালীর যুদ্ধে এসে নিহত হওয়া, মন্থরার দেহে শূর্পণখার প্রবেশ, সিংহাসন লাভের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতা স্থাপন ইত্যাদি ঘটনা লেখকের মৌলিক চিন্তার ফসল। এদিক থেকে নাট্যকার রামায়ণকাহিনীর নব রূপায়ণ ঘটিয়েছেন বলা যায়।

চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। রাম, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, মাল্যবান, বিভীষণ, কৈকেয়ী, মন্থরা প্রমুখ চরিত্রগুলো সুন্দররূপে চিত্রিত করেছেন। লঙ্কা ও অলকা দুটি নগরীকে চরিত্ররূপে নাটকে উপস্থাপিত করায় বিশেষ একটি মাত্রা যোগ হয়েছে। রাম চরিত্রকে নাট্যকার নিষ্কলঙ্ক করেছেন। কৈকেয়ী চরিত্রটিকেও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। নাটকটির রচনারীতিও প্রশংসনীয়। ভবভূতির মধ্যে কবিসত্তা সর্বদা জাগ্রত। এ নাটকের সংলাপগুলো কবিত্বস্পর্শে প্রাণবন্ত। ভবভূতি তাঁর নাটকে প্রাচীন সংস্কার ভাঙার সাহস দেখিয়েছেন। জনপ্রিয় রামকথাকে তিনি নিজের মত করে সাজিয়েছেন। এ নাটকে বীররস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

***উত্তররামচরিত*র বিশিষ্টতা:**

প্রথমত, নাট্যকার করুণরস সৃষ্টিতে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। ভবভূতির জীবন দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ নাটকে তাঁর বাস্তব জীবনের ছায়া পড়েছিল। তিনি নির্মল সুখ কখনোই অনুভব করেন নি। তাঁর সুখের অন্তরালে তাই দুঃখ ছায়া ফেলে। *উত্তররামচরিত* নাটকের বিভিন্ন স্থানে করুণরসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথম অঙ্কে চিত্রগৃহে জনস্থান প্রদেশের চিত্র দেখে রাম ভেবেছেন 'অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্'।[৪৯] অর্থাৎ সীতা হরণের পর জনস্থান প্রদেশের পাথরও কেঁদেছিল, বজ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল। তৃতীয় অঙ্কে, শম্বুক নিধন উপলক্ষে দণ্ডকারণ্য পরিদর্শন করার সময় সীতার স্মৃতি তাঁর মনকে বেদনাবিক্ষুব্ধ করে তোলে। সপ্তম অঙ্কে, নাট্যাভিনয় দর্শনকালে সীতার দুর্দশা দেখে রাম শোকে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দুঃখিনী সীতার অন্তর্গ্লানিতে দগ্ধ রাম যেন করুণ রসের প্রতিমূর্তি। এ প্রসঙ্গে Arthur. A. Macdonell বলেছেন—

> The description of the tender love of Rama and Sita, purified by sorrow, exhibits more genuine pathos than appears in perhaps in any other Indian drama.[৫০]

দ্বিতীয়ত, নাটকের কাহিনী বিন্যাসে, কল্পনাশক্তির নতুনত্বে, চরিত্রগুলোর মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির *রামায়ণের* উত্তর কাণ্ড অবলম্বনে *উত্তররামচরিত* নাটক রচিত হলেও কবি নিজের কল্পকুশলতার পরিচয় রেখেছেন নাটকে। রাম চরিত্রে রাজসত্তা ও স্বামীসত্তার দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

তৃতীয়ত, ভবভূতি রাম-সীতার দাম্পত্যপ্রেমের যে সুন্দর, শুচিশুভ্র, আবেগময় রূপ অঙ্কন করেছেন তা এর পূর্বে আমরা পাই নি। ত্যাগ ও দুঃখের হোমানলে বিশুদ্ধ প্রেমের যে জটিল মনস্তত্ত্ব-সম্মত রূপ ভবভূতি এঁকেছেন, তাতে তাঁর নাটককে কোন কোন পণ্ডিত মনঃসমীক্ষণাত্মক নাটক হিসেবে অভিহিত করেছেন। নাট্যকার কবিত্বময় ও ভাবাবেগপূর্ণ মহৎ প্রেমের চিত্র এঁকেছেন। তবে এ ভাবাবেগ কখনো কখনো বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Arthur. A. Macdonell বলেছেন—

> Owing to lack of action, however, it is rather a dramatic poem than a play.[৫১]

চতুর্থত, ভবভূতি তাঁর নাটকে লঘুতাকে পরিহার করেছেন। তাঁর নাটকে বিদূষকের কোন ভূমিকা নেই। কালিদাসের বর্ণনায় পাঠকের মনে হিল্লোল সৃষ্টি হয়, আর ভবভূতির বর্ণনায় পাঠকের মন অভিভূত হয়ে যায়। এর কারণ, তাঁর রচনায় এমন একটি গাম্ভীর্য, বলিষ্ঠ আবেগ, জোগুণ ও বিশাল মহিমাময় রূপ থাকে যা পাঠককে মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে Dr. Susil Kumar De বলেছেন, Bhavabhuti can not write in the lighter vein, but takes his subject too seriously; he has no humour, but enough of dramatic irony; he can hardly attain perfect artistic aloofness, but too often merges himself in his subject; he has more feelings than real poetry[৫২]

পঞ্চমত, ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে ভবভূতির নিজস্ব একটা বিশ্বাস ছিল। তিনি বলেছেন, 'চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতাচ' ।[৫৩] অর্থাৎ চিত্রাত্মক কথা ও বাকবৈদগ্ধপূর্ণ সংলাপই নাটকে থাকা উচিৎ। *উত্তররামচরিত* নাটকেও চিত্রাত্মক বাক্যের অভাব নেই। নিসর্গের শান্ত, সুন্দর রূপের চিত্র নাট্যকার দক্ষতার সাথে অঙ্কন করেছেন। বাকবৈদগ্ধ তাঁর নাটকের প্রায় সর্বত্র বললেও ভুল হবে না। ভাষার দিক দিয়ে তিনি গৌড়ীয় রীতিকে নির্বাচন করেছিলেন। এই রীতিতে বাগাড়ম্বরের প্রাধান্য দেখা যায়। ভবভূতি এই রীতি গ্রহণ করে তাঁর নাটকে বাকবৈদগ্ধপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

মালতীমাধবর বিশিষ্টতা

এই নাটকটির মূল রস শৃঙ্গার। মালতী-মাধব ও মকরন্দ-মদয়ন্তিকার প্রণয়বৃত্তান্ত রচনায় লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্র রস সৃষ্টিতে ভবভূতি পারদর্শী। তৃতীয় অঙ্কে, মকরন্দের সঙ্গে বাঘের লড়াই, মকরন্দ ও মাধবের সঙ্গে রাজসৈন্যদের লড়াই ইত্যাদি অংশে রৌদ্ররসের প্রকাশ দেখা যায়। মহাশ্মশানের বর্ণনা, মাংসাহুতি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত

চিতাবহ্নি, নরমাংস বিক্রয়, কাপালিক অঘোরঘণ্টের তান্ত্রিক আচার, দেবীর সামনে নরবলী, প্রেত-পিশাচের ভোজনোল্লাস প্রভৃতি বর্ণনায় বীভৎস রসের সঞ্চার হয়েছে। মালতীকে হারানোর পর মাধবের বিরহকাতর অবস্থার বর্ণনায় করুণ রসের প্রকাশ ঘটেছে। মকরন্দ বধূ সেজে নন্দনকে ঠকিয়েছে যা নাটকে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। চরিত্র সৃষ্টিতেও নাট্যকার সফল হয়েছেন। মালতী, মাধব, মকরন্দ, মদয়ন্তিকা, কামন্দকী, লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা, কাপালিক অঘোরঘণ্ট, কপালকুণ্ডলা সব চরিত্রই উজ্জ্বল। *মালতীমাধব* নাটকের ঘটনাগতি স্বাভাবিক, নাটকের পরিণাম সম্পর্কে দর্শকদের ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে তিনি সফল। লেখক ইচ্ছা পূরণের গল্পই এখানে বলেছেন। আর তা করতে গিয়ে নাটকীয় ঘটনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। *মালতীমাধব* নাটকের নায়ক-নায়িকা কেউই রাজপরিবারভুক্ত নয়। অমাত্যপুত্র, অমাত্যকন্যা ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চরিত্রলিপি সাজানো হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ও কবিত্বের নিদর্শন হিসেবে *মালতীমাধব* একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

সমালোচনা:

ভবভূতি *মহাবীরচরিত* নাটকে রাবণ, মাল্যবান, বালী, সুগ্রীব, শূর্পণখা প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন সত্য, কিন্তু যথার্থ নাট্যরস সৃষ্টিতে সফল হন নি। *মালতীমাধবের* ন্যায় বিন্যাসগত ত্রুটি না থাকলেও চরিত্রচিত্রণ ও নাট্যরসের আবেদনে এটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল নাটক। ভবভূতি এই নাটকে প্রাচীন সংস্কার ভেঙ্গে জনপ্রিয় ও চিরায়ত রামকথার বিন্যাসে কিঞ্চিত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নাটকের উৎকর্ষ সাধনে সেগুলো বিশেষ সহায়ক হয় নি। উপরন্তু সংস্কারপন্থী দর্শক ও বুদ্ধিজীবীরা নাট্যকারের এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হয়তো অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এমন অনুমান খুব দুঃসাহসিক নয় এবং সে কারণেই তাঁর জীবদ্দশায় নাটকটি ততটা জনপ্রিয়তা পায় নি। ভবভূতির আলোচ্য নাটকে দীর্ঘবিস্তারী বর্ণনা ও ভাষার আড়ম্বরে নাট্যগতি ব্যাহত হয়েছে। রাম ও পরশুরামের মধ্যে দুই অঙ্কব্যাপী বিবাদ-বিসম্বাদ কবিত্বও নিষ্ফল শ্রমে পর্যবসিত। এ নাটকে সাহিত্য পরম্পরায় শৃঙ্গাররসের প্রথাসিদ্ধ একক প্রাধান্য অস্বীকার করে বীররসকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নাট্যকারের অভিপ্রেত।[৫৪] এ কারণেই শৃঙ্গার ও হাস্যরসের অভাবে সেই বীররস নাটকীয় চরিত্রে যতই ফুটেছে; দর্শক ও পাঠক ততই ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। এরিস্টোটল এবং ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ বলেন যে, নাটকে মহাকাব্যের মত খুব বেশি উপাখ্যান থাকা উচিত নয়। ভবভূতি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে মহাকাব্যের ধাঁচে *মহাবীরচরিত* রচনা করায় নাটকটি সফলতা লাভ করতে পারে নি। আবার *মহাবীরচরিত* নাটকটি সফলতা লাভ করতে না পারার আরেকটি কারণ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ এবং দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার। *উত্তররামচরিত* নাটকে বাগাড়ম্বর, দীর্ঘ সমাসবহুল শব্দের ব্যবহার, রচনায় কখনো কখনো অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করেছে ও নাট্যরস ব্যাহত হয়েছে। গীতিময়তাও কোন কোন সময় নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে। এ কারণে ইংরেজ সমালোচক Arthur. A. Macdonell একে

বলেছেন `Dramatic Poem'. আসলে অধিক কাব্যময়তা অনেক সময় নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয় না। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভবভূতির রচনাশৈলী প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভবভূতি তাঁহার গ্রন্থে গৌড়ীরীতির অনুবর্তন অনেক স্থানেই করিয়েছেন; ফলে দীর্ঘ সমাসবহুল পদ ও দুরূহ শব্দ পাঠকের পক্ষে বিরক্তিকর মনে হয়। এইরূপ অক্ষরাড়ম্বর বিশেষ করিয়া নাট্যগ্রন্থে নিতান্তই অনুপযোগী। ভবভূতির পদ্য অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতাযুক্ত। ভবভূতির প্রাকৃতেও অতিমাত্রায় কৃত্রিমতা লক্ষ করা যায়।"[৫৫]

মালতীমাধব নাটকের ভাষারীতি সর্বদা প্রশংসার যোগ্য নয়। কখনো কখনো নাট্যকার ভাবাতিশয্যে ভেসে গেছেন। অর্থাৎ সংযম ও সঙ্গতির অভাব ঘটেছে কোন কোন সময়। কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যকারের ভিতরের কবিসত্তাটি বড় হয়ে উঠে নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করেছে। খুব বেশি কাব্যময়তা নাট্যরসকে ব্যাহত করেছে। এছাড়া দীর্ঘ সমাসবহুল শব্দের ব্যবহার, গদ্যাংশের আধিক্য নাটকের রসকে জমাট বাঁধতে দেয় নি। নাটকটিতে মূল কাহিনী থেকে উপকাহিনীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। এর ফলে, মূল কাহিনী উপকাহিনী দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে পার্শ্বচরিত্র মকরন্দের পাশে নায়কচরিত্র মাধব যেন অনেকটাই ম্লান। নাটকের সংলাপে বড় বড় সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ বড়ই অস্বস্তিকর। অথচ এ প্রকরণে বারে বারেই তা পাওয়া যাবে। ভবভূতির রচনার অপর ত্রুটি মাত্রাহীনতা। অত্যন্ত সঙ্কটময় অবস্থাতেও কথা সংক্ষেপ নেই। মাধবের জন্য কাতর হয়ে মকরন্দ মরতে চলেছে— কিন্তু সখার জন্য হা-হুতাশের অন্ত নেই। নাটকটির নবম অঙ্কের পুরোটাকেই মাত্রাহীনতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করা যায়। আর এই সমস্ত কারণেই মালতীমাধব প্রকরণ তেমন সমাদর লাভ করে নি। তবে ভবভূতির রচনায় সামান্য ত্রুটি থাকলেও তিনি নাট্যকলার সঙ্গে কাব্যকলার যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন তার গুরুত্বও কম নয়। Dr. Susil Kumar De বলেছেন, `It requires a cosiderable mastery of the dramatic art to convert it from a real tragedy into a real comedy of happiness and reunion'.[৫৬]

সার্বিক বিচারে অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ভবভূতি কালিদাসোত্তর যুগের সংস্কৃত সাহিত্য জগতে বিশেষ মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত। পণ্ডিতদের মতে, মহাকবি কালিদাসের পরই তাঁর স্থান।[৫৭] ভবভূতি তাঁর নাটকত্রয়ে বিচিত্র রস সৃষ্টি করেছেন। *মহাবীরচরিতের* মূল রস বীররস, মালতীমাধবের মূল রস শৃঙ্গাররস, *উত্তররামচরিতের* প্রধান রস করুণরস। তিনটি নাটকে ভবভূতির কবিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। চিত্রময়তা তাঁর রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রতিটি রচনায় শব্দ দিয়ে নানা-চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। মানব হৃদয়ের যে বেদনা বঙ্কিমচন্দ্রের *উত্তরচরিত* প্রবন্ধে চিত্রিত হয়েছে তা অনবদ্য। *উত্তরচরিত* করুণে মধুরে অদ্বিতীয়। কালিদাসেও এত রসের বৈচিত্র্য নেই। আবার মধুর রস সৃষ্টিতে ভবভূতির মৌলিকতা যে দুর্লক্ষ্য তা নয়।

মূলত করুণ রসের নাট্যকার হলেও বীরত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনায় ভবভূতি অনেক ক্ষেত্রে তার পূর্বসুরী কালিদাসকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন— *মহাবীরচরিতে* পরশুরামের রুদ্র পৌরুষ এবং ধীর গম্ভীর রামচন্দ্রের বীরত্ব মনে রেখাপাত করে। কালিদাসেও রসের এত বৈচিত্র্য নেই। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভবভূতির *মহাবীরচরিত* ধ্রুপদী নাট্যরীতির সার্থক সৃষ্টি। ভবভূতি যে শৈলী অনুসরণ করেছেন, প্রথিতযশা নাট্যকারদের রচনায় তা সুলভ; তবে ভাষার আড়ম্বর, শিল্পিত মণ্ডনকলা এবং সার্বিক বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পী।

তাঁর *উত্তররামচরিতে* যে গীতিময়তা আছে তা কাব্যসম্পদ হিসেবে মূল্যবান। করুণ রসের উদ্বোধনে নাট্যকারের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় অবিসংবাদিত। ভবভূতি দেহাতীত প্রেমের রূপানুসন্ধান করেছেন । বিরহের আগুনে পুড়ে প্রেম কিভাবে হেমে পরিণত হয় তা তিনি দেখিয়েছেন। প্রেম চিত্রাঙ্কনে কালিদাস ও ভবভূতি স্বগোত্র নন। কালিদাসের প্রেম বর্ণনা শিল্প সমুজ্জ্বল। তাতে দীপ্তি আছে, ঐশ্বর্য আছে। ভবভূতি সে ক্ষেত্রে অনুভূতির নিবিড়তায় সান্দ্র। ভবভূতির প্রেম স্পর্শকাতর, স্পর্শে অভিভূত এবং সঞ্জীবিত। এ স্পর্শ অনির্বাচ্য— “বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।”[৫৮]

ভবভূতি বিরহেও প্রেমের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। যেমন— রামচন্দ্র বলেছেন, বিরহে যে কোন সান্ত্বনা নেই একথা বলা যায় না। বিরহের ধ্যানে প্রিয়জনের মুক্তি যেন এক বিশেষরূপে চোখের সামনে উপস্থিত হয়। ভবভূতির আরেকটি গুণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা। এ ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম বস্তুজ্ঞানের পরিচয় লক্ষ করা যায়। দণ্ডক তথা পঞ্চবটীর অরণ্যশ্রী জনস্থানের গিরি-ঝর্ণার বর্ণনাগুলো জীবন্ত ও স্বাভাবিক। প্রকৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে জড়প্রকৃতি মাত্র নয়; মূর্তিমতি মানববিগ্রহ। বনদেবী বাসন্তীর মত মূরলা, তমসা ও ভাগীরথীও যেন মূর্তিমতি । এ ক্ষেত্রে ভবভূতি পৌরাণিক সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভবভূতির উপমা বস্তু ও ভাবনিষ্ঠ। এ দিক দিয়ে শেলির রচনার সাথে তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর উপমায় একটি বস্তুর সাথে একটি ভাবের তুলনা বিদ্যমান— যা মৌলিকতার পরিচয় বহন করে। *মালতীমাধব* প্রকরণে নাট্যকার ভবভূতি সুকৌশলে মকরন্দ-মদয়ন্তিকার প্রণয়কাহিনীর অবতারণা করেছেন। নাটকটি দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও নাট্যকার সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে এই দুটি সমান্তরাল অথচ বিপরীতধর্মী প্রেমকাহিনীর সযত্ন বিন্যাস ঘটিয়ে শ্রোতাদের কৌতূহল জাগ্রত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই নাটকে শৃঙ্গার রসের বর্ণনা থাকলেও নাট্যকার যে অদ্ভুত, বীভৎস ও রৌদ্র রসের অবতারণা করেছেন, তা অভিনব। এ নাটকে ভবভূতি প্রেম-মনস্তত্ত্বের নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির আরেকটি দিক হল বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাদের চিত্র ও আদর্শ। তাদের মায়া-মমতা, বাৎসল্য, ব্রত প্রভৃতি ভবভূতি সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন।

তথ্যসূচি:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *অষ্টম খণ্ড* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, আষাঢ়, ১৩৭৪), সাহিত্য, সাহিত্যসামগ্রী, পৃ. ৩৪৭

২. শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন* (ঢাকা: বর্ণবিচিত্রা, আগস্ট, ২০০৩), পৃ. ২০

৩. "বাক্যম্ রসাত্মকম্ কাব্যম্।"– বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২২

৪. "শ্রব্যং শ্রোতব্যমাত্রং ..."–*তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৮৮

৫. "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং..."– *তদেব*, পৃ. ২৮১

৬. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সীতানাথ আচার্য, দেবকুমার দাস সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১), পৃ. ৫–৬; বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ*, অনিল চন্দ্র বসু সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭), ৪/৩/৬

৭. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ খণ্ড*, গোরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৮২),১/৫৪; বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ*, *প্রাগুক্ত*, ১/২/১২

৮. কল্হন, *রাজতরঙ্গিণী*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ২১ *খণ্ড*, গোরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৪), ৪/১৪৪, পৃ. ১৪২

৯. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ১/২৮

১০. *তদেব*, ৪/৩৮

১১. *তদেব*, *পৃ. ৯৪*

১২. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ১/১২

১৩. *তদেব*, *পৃ.* ২৩

১৪. *তদেব*, *পৃ.* ৩৯

১৫. ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, *প্রাগুক্ত*, ২/১-২

১৬. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৮২), ২/৪৮

১৭. *তদেব*, ১/৩০

১৮. *তদেব*, ৬/৬২

১৯. *তদেব*, ৪/২

২০. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ৩/৬৯

২১. ÒThe Hero of Valmiki's *Ramayana* is the cherished idol of millions of worshipping Hindus, who regard him as the seventh incarnation of God and to whom he is the embodiment of every social and domestic virtue." Bhavabhuti, *Uttararamacharita,* M.

R. Kale ed. (Delhi: Motilal Banarsidas Publishers, 4th edition reprint, 2003), Introduction, p. 33.

২২. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সীতানাথ আচার্য, দেবকুমার দাস সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১), ১/১২

২৩. *তদেব*, তৃতীয় অঙ্ক, পৃ. ২৯

২৪. *তদেব*, ৭/৫

২৫. *তদেব*, ২/৭

২৬. *তদেব*, ৫/১০

২৭. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, জুন, ২০১১), ৫/৩২

২৮. ÒKusa is brought on the stage for a comparatively short space of time; but even then he proves himself a worthy elder brother of the intrepid Lava.” Bhavabhuti, *Uttararamacharita,* M. R. Kale ed. *op. cit.* p. 38.

২৯. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ৬/৮

৩০. It is a noteworthy coincidence that all of them were subjected to very severe tests in which their purity, courage, patience and other virtues were severely tried and nobly did they come out through those tests” Bhavabhuti, *Uttararamacharita,* M. R. Kale ed. *op. cit.* p. 35-36.

৩১. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৩২. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ২/১

৩৩. ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৮৮৫ শকাব্দ), ৫/৩০।

৩৪. “একস্যামেব নায়িকায়ামাসক্তো ঽনুকূলো নায়কঃ।”– বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯৯

৩৫. ভবভূতি, *মালতীমাধবম*, *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩৫৩

৩৬. Bhavabhuti, Malatimadhava, M. R. Kale ed. (Bomby: Messrs Gopal Narayen and Co. 2nd edition, 1928), Introduction, p. 28.

৩৭. Ibid, p. 36.

৩৮. ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, *প্রাগুক্ত*, ২/৮

৩৯. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ৩/৬

৪০. *তদেব*, ৪/১

৪১. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ২/৮

৪২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার*, *প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: ডি,এম, লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৮০

৪৩. ভবভূতি, *মালতীমাধবম*, *প্রাগুক্ত*, ৫/১–২

৪৪. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০

৪৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, *প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ৩২০–৩২১

৪৬. ভবভূতি, *মালতীমাধবম*, *প্রাগুক্ত*, *প্রথম অঙ্ক*, পৃ. ২৮

৪৭. *তদেব*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃ. ১৩৯

৪৮. *তদেব*, ষষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩১৩

৪৯. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, ১/২৮

৫০. Arthur. A. Macdonell, *A History of Sanskrit Literature*, (Dellhi; Sundarlal Jain, Motilal Banarsidass Publishers, 1965), p. 308.

৫১. *Ibid*, p. 308.

৫২. Dr. Susil Kumar De, *History of Sanskrit Literatur, (*Calcutta: Calcutta University Publishers, 1947), p. 294-295.

৫৩. ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, *প্রাগুক্ত*, ১/8

৫৪. ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ১/৩

৫৫. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (*দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য*), [কলকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, মাঘ, ১৩৭৭], পৃ. ১৪১

৫৬. Dr. Susil Kumar De, *History of Sanskrit Literatur*, *op*. *cit*. p. 294.

৫৭. কালিদাস, *মেঘদূতম্*, কানাইলাল রায় সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪), পূর্বমেঘ-৫

৫৮. ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৬ খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১/৩৫